Vol. 44 | No. 1 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দের কাব্যে উপমা

Volume	44
Issue	1
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hakim Arif
Published online	October 1, 2000
DOI	10.62328/sp.v44i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i1.2
Pages	২১-৩০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জীবনানন্দের কাব্যে উপমা

হাকিম আরিফ*

জীবনানন্দীয় কাব্যভুবন নির্মাণে উপমা হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্র্যের অভিধাস্পর্শী এক চিরায়ত কৃৎকৌশল। রবীন্দ্র-কবিতার মোহনীয় ও রোমান্টিক পেলবতার প্রতিপক্ষে তিরিশীয় কাব্যস্বরের প্রতিধ্বনিরূপে জীবনের অর্থহীনতা, দুর্মর সময়ের অস্থিরতা, সময়গত ও স্থানগত বন্ধ্যা ও নিষ্ফলা অনুভব জীবনানন্দের কবিতায় বিষয়ভাবনারূপে যত না উচ্চকিত হয়ে উঠেছে, তার চেয়ে অধিক তীব্রতায় চরিতার্থ হয়েছে কবির ইতিহাসচেতনা, ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক নির্জনতার বিচিত্র অনুষঙ্গ, জীবনের নৈঃসঙ্গ্য ও নিরাত্মীয়তাবোধের কবিতাময়তা এবং যুগপৎ জীবনের তীব্র আসক্তির স্মারক বিচিত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও রঙ-রূপের শিল্পগত উপস্থিতি— যা প্রকারান্তরে বাংলা কবিতায় নির্মাণ করেছে স্বতন্ত্রবীক্ষা। আর তাঁর কবিতার এই বিষয়গত অভিনতুনত্বের অনুসমর্থনে কবিতার শরীরেও অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে নতুন নান্দনিকতার সুর— যা উপমার মধ্যে অনেক বেশি প্রাণময় ও সত্তাবান। সর্বোপরি, পাঠকের সঙ্গে কবির সংজ্ঞাপনের সেতুবন্ধরূপে ভাষার 'কবিতা' হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের উপমা বরাবরই উদ্যমী ও উদ্যোগী।

উপমা হচ্ছে কবির কবিতা-শরীরের সেই আলংকারিক অবলম্বন যার সাহায্যে তাঁর কাব্যভাষা জীবনের আটপৌরে ভাষার সঙ্গে সৃজন করে নিশ্চিত বিশিষ্টতা ও অনন্যপরতা। পরিণতিতে কাব্যভাষা হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনামণ্ডিত, ভাবনাতাড়িত ও ব্যাখ্যাবহুল। এভাবে উপমার যাদুস্পর্শে কবিতা পায় নতুন দ্যুতি, মোহনীয় ঔজ্জ্বল্যে অভিস্নাত হয় কবির বোধ ও বোধি এবং পাঠক আলোড়িত হয় তাৎপর্যমণ্ডিত কাব্যিক সত্য ও সৌন্দর্যে।

কবিতায় কবি তীব্র আবেগের বাতাবরণে জীবনের নানামাত্রিক রূপবত্তাকে নির্মাণ করে তাকে নবোদ্ভূত চৈতন্যে উত্তরণ ঘটান। আর এই রূপবত্তা তথা সৌন্দর্য উপস্থাপনাসহ তাকে নবোদ্ভূত চৈতন্যে উত্তরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে কবিকে তাঁর আবেগের যথার্থ প্রকাশের তাগিদে যেমন সৃজন ও অন্বেষণ করতে হয় উপযুক্ত শব্দের তেমনি মেলাতে হয় আবেগ ও অভিজ্ঞতাকে। ফলে কবি তাঁর কবিতার উদ্দীষ্ট বিষয়ের বিচিত্র অনুষঙ্গের সঙ্গে অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিষয় ও অনুভবের স্থাপন করেন তুলনা, প্রতি-তুলনা ও অনিন্দ্য সাদৃশ্যসৌধ। এভাবেই কবিতা-শরীর তুল্য হয়ে ওঠে বস্তুর সঙ্গে ভাবের, রূপের সঙ্গে অরূপের, অদৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যমানতার, সীমার সঙ্গে অসীমের এবং প্রাপনীয়ের

* লেকচারার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সঙ্গে অপ্রাপ্যতা তথা অপরিচয়ের। এই পরম্পরা ও রূপগত বিন্যাসে কবিতা-শরীরে যে নির্মাণ-কৌশল সৃজিত হয় এবং প্রতিষ্ঠা পায় শিল্প-কৌশল তথা কবিতাণু তারই আলংকারিক অভিধা উপমা। মূলত উপরি-উক্ত যৌক্তিক কারণেই কবিতায় কাব্যময়তা সৃষ্টির আন্তর তাগিদে তথা কবিতাকে শিল্পে উত্তরণের স্বার্থে সমৃদ্ধ ও অনিঃশেষ এবং প্রেরণাব্যঞ্জিত অন্যতম আলংকারিক উপাদানরূপেই উপমার চরিতার্থতা নিহিত।

কবিতায় কবি সৌন্দর্যকে অনুধ্যান করেন, এবং নির্মাণ করেন উপলব্ধির রূপময় বাক্‌জাল। ফলে এতে যে নান্দনিকতা ও আবেগময়তা পরিস্ফুট হয় তার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে সৌন্দর্যচেতনা। আর এক্ষেত্রে কবিকে তাঁর অভীষ্ট কবিতার বিভিন্ন ধারণা ও অবধারণার এককে সেই কাঙ্ক্ষিত নন্দনবোধকে প্রতিস্থাপনের যৌক্তিক কারণে আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যধারক কোন বিষয় ও ভাবের সঙ্গে নির্মাণ করতে হয় একরূপতা। কেননা এভাবেই সেই সৌন্দর্যধারক বিষয় ও ভাবনার নান্দনিক অনুভব মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যায় কবিতা-শরীরের ছত্রে-উপছত্রে এবং সৃজিত হয় কবিতা-ভাষার অন্যতম মৌলসূত্র। সর্বোপরি কবিতার উপরি-উক্ত অনন্য মিথস্ক্রিয়াসমৃদ্ধ আলংকারিক নির্মাণ উপমার সাহায্যে যত অনুপুঙ্খতায় প্রত্যক্ষীভূত হয়ে ওঠে, অন্য কিছুতেই তা সম্ভব নয়।

মানবহৃদয় হচ্ছে চির রহস্যপূর্ণ এক দুর্জ্ঞেয় অঞ্চল। আর এই হৃদয়বৃত্তি তথা চিত্তানন্দের নিরুপম শিল্পভাষ্য হচ্ছে কবিতা— যা নান্দনিক কল্পরূপ হিসেবে মেধাকে যত না শাণিত করে, আবেগ বা সংবেদনকে ততোধিক উদ্দীপ্ত ও আলোড়িত করে। কিন্তু কবিতা যেহেতু দুর্জ্ঞেয় মননবিশ্বের এক অলংকৃত ভাষিক চারুময়তা, তাই পাঠকের সঙ্গে এর এক ধরনের দুর্বোধ্যতা, দ্ব্যর্থকতা ও আলো-আঁধারির খেলা চিরকালীন। তাই পাঠক চিরকালই কবিতার গভীরতলের নিহিত ভাবার্থ বা ব্যঞ্জনাকে উদ্ধারে যত না তৎপর হয়েছে, তার চেয়ে অধিক নিষ্ঠায় এর উপরিতলের চিত্তনন্দনতা উপভোগে তন্ময় ও বিমুগ্ধ হয়েছে। আর উপমা হচ্ছে কবিতার এই উপরিতলের সৌন্দর্য অবলোকনের অন্যতম সহায়ক অলংকার। কেননা উপমা কবিতায় ভাষিক দৃশ্যচিত্রের উন্মোচন ঘটায় বলে পাঠক এই দৃশ্যচিত্রের অবলোকন ও অনুধাবনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কবির কাব্যভাষা ও ভাবের সঙ্গে উপলব্ধিসাধ্য মানসিক সংজ্ঞাপকক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এভাবে উপমা হয়ে ওঠে কবিতার প্রাথমিক দুরূহতা ও রহস্য উন্মোচনের সফল হাতিয়ার।

উপমাই কবিত্ব[১]— স্বসৃষ্ট প্রবাদসদৃশ এই উক্তির মাধ্যমে জীবনানন্দ দাশ কবিতায় উপমা অলংকারের তাৎপর্য ও গুরুত্বকে যেমন অভিব্যঞ্জিত করেছেন, তেমনি কবিত্বশক্তির মৌলিকত্বরূপে একেই নিদান মেনেছেন এবং এর সপক্ষে তাঁর কবিতায় তিনি সৃজন করেছেন অজস্র উপমা। জীবনানন্দের কবিতার এই উপমাবহুলতা ও আধিক্য যেমন কাব্যভাবনার নিয়ামকরূপে তাঁর স্বীয় কবিপ্রতিভার মৌলিকত্বকেই নির্দেশ করছে, তেমনি অন্যদিকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও কৃৎকৌশলমণ্ডিত রূপায়ণ দক্ষতায় এগুলো বাংলা সাহিত্যে হয়ে উঠেছে অনন্য, স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধিত ও আধুনিক। মূলত জীবনানন্দের কাব্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপমা সৃজন ও প্রয়োগনৈপুণ্যের সারাৎসার উপস্থাপনই এ প্রবন্ধের মুখ্য বিবেচনা। জীবনানন্দের কবিতায় প্রযুক্ত উপমা অলংকারের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও মেধাসম্পৃক্ত

সৃজনধর্ম সম্পর্কে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর অতিশয়োক্তি ও সমর্থন এবং এতদ্‌সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার ব্যাপারে তাঁর প্রত্যয়[২] এই প্রবন্ধের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার গভীরতল বা এর নিহিতার্থ অনেক বেশি দুরধিগম্য, জটিল, সুদূর ও আধুনিক জমাট মনোবিশ্বসমৃদ্ধ এবং প্রগাঢ় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ তাঁর কবিতার গভীরতলের ভাঁজে ভাঁজে জমা হয়ে আছে নানা ইতিহাস, পুরাণ ও প্রত্নসমাজের চরিত্র ও অনুষঙ্গ, চরিতার্থতা: বিশশতকীয় গহন মনোবাস্তবতার রূপ-রূপান্তর; ব্যক্তিগত অপূর্ণতা , স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। প্রতিপক্ষে তার কবিতার উপরিতল অনিক বেশি ইন্দ্রিয় সংবেদনাযুক্ত, দৃশ্যময় ও আবেদনসম্পৃক্ত। কারণ কবিতায় তিনি উদ্দীষ্ট বস্তু বা ভাবের সঙ্গে রূপ ও অরূপের সাদৃশ্য ও সমীকরণের সাহায্যে দৃশ্যময় ও চিত্রসম্পৃক্ত যে অভিনব কবিতা-শরীর নির্মাণ করেছেন তা শুধু আকর্ষণীয়ই নয় বরং একাধারে স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ও বিবিধ রঙের অনুভবসমৃদ্ধ। ফলে পাঠক তাঁর কবিতার গভীরতলের বক্তব্য উপলব্ধি ব্যতিরেকে অনেক আপনলগ্ন হয়ে, মুখ্যত উপরিতলের দৃশ্য ও চিত্রসমৃদ্ধ সৌন্দর্য আহরণ করে। আর উপরি-উক্ত দৃশ্য ও চিত্রসমৃদ্ধ সৌন্দর্য বিনির্মাণে জীবনানন্দের কবিতায় উপমা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বোপরি, কবিতায় উপমা অলংকারের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ দাশ সৃজন করেছেন ছবি ও চিত্রের সৌধমালা। এভাবেই জীবনানন্দের কবিতা উপমাসমৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাদ ,গন্ধ, রঙ ও স্পর্শের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়নে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়[৩]—

তোমার ছায়ার মতো ফিরিয়াছি তোমার পেছনে।

['অনেক আকাশ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

সুবাস ছড়াই উশীরের মতো, ধূপের মতন দহি।

['নব নবীনের লাগি', *ঝরা পালক*]

তোমার ক্ষীরের মতো মৃদু দেহ— ধূসর চিবুক, বাম হাত ...

['একদিন যদি আমি', *রূপসী বাংলা*]

ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,

['ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', *ঝরা পালক*]

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিসমূহের 'ছায়ার মতো ফেরা', 'উশীরের মতো সুবাস ছড়ানো' ও 'ধূপের মতো দগ্ধ হওয়া', 'ক্ষীরের মতো দেহ' এবং 'ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট' ও রাঙা আপেলের মতো গালের' সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমরা যথাক্রমে স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ ও রঙের ইন্দ্রিয়সংবেদনকেই প্রত্যক্ষ করি।

কবিতায় উপমা অলংকার নির্মাণের সময় কবি উপমেয় পদের সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদান বা তুলনা-আরোপের জন্য যে উপমান পদ কল্পনা করেন, তা প্রধানত আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কোন না কোন বিষয় বা বস্তু হয়ে থাকে, যদিও আপাতদৃষ্টে সংশ্লিষ্ট উপমান ও উপমেয়

পদে কোন বাহ্যিক সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয় না; বরং কবি-কল্পনাসম্পৃক্ত আবেগসমৃদ্ধ অনুভবের কল্যাণেই এদের মধ্যে গভীরতলের সাদৃশ্য প্রযুক্ত হয়। উপমা অলংকার নির্মাণের এই প্রক্রিয়া ও ধারণাটি মোটামুটিভাবে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত। অর্থাৎ উপমেয় পদের সঙ্গে উপমান পদের আপাত: সাদৃশ্য বর্তমান না থাকলেও উপমান পদটি চয়িত হয়ে থাকে সাধারণত কবি ও পাঠক উভয়েরই অভিজ্ঞতাধীন ও পরিচিত জগৎ থেকে। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশের পূর্বে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের মধ্যেও উপমা সৃজনের উপর্যুক্ত পদ্ধতি প্রবহমান। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্ট কিছু উপমা অলংকারের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো।

['স্বপ্ন', *কল্পনা*]

দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো, সন্ধ্যাতারা করে।

['স্বপ্ন', *কল্পনা*]

চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।

['নিরুদ্দেশ যাত্রা', *সোনার তরী*]

প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি।

['বিজয়িনী', *চিত্রা*]

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।

['উদ্‌বোধন', *ক্ষণিকা*]

উপরে উদ্ধৃত উপমা অলংকারগুলিতে উপমান পদসমূহ যথা— 'সন্ধ্যার পাখি', 'সন্ধ্যার লক্ষ্মী', 'আশা', 'প্রথম প্রেম', 'আলো' ইত্যাদি সৃজন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের চিরচেনা পরিদৃশ্যমান চরাচরের ভাব ও বিষয় থেকে সমকালের কোলাহল উদ্দীপ্ত রোজকার ও প্রাপনীয় বস্তুর তুলনায় নিসর্গ বা কল্পলোকেই দৃষ্টিপাত করেছেন সমধিক।[৪] ফলে রবীন্দ্রনাথের উপমা অলংকার কাব্যধর্মী মোহনীয়তা ও সংবেদন সৃষ্টি করলেও আমাদের বিস্মিত করে না, চেতনা ও বিশ্বাসের জগৎকে আমূল নাড়া দেয় না। জীবনানন্দ দাশও তাঁর প্রথম কাব্য *ঝরা পালক* (১৩৩৪)-এ উপমা নির্মাণে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা পূর্ববর্তী অন্য কবিদের অনুসারী। যেমন—

তোতার মতন চকিতে কখন আমি আসিয়াছি ভেসে।

[আমি কবি— সেই কবি]

কোন্ কিশোরীর চুড়ির মতন হায়

পেয়ালা তাদের থেকে থেকে বেজে যায়...

[জীবন-মরণ দুয়ারে আমার]

উদাস উধাও হাওয়ার মতন চকিতে যায় সে উড়ে, [বেদিয়া]

আমার দেহের ছায়ার মতো, জড়িয়ে আছে মনের সনে [চলছি উধাও]

চকোরজুড়ির মতো কুহরিয়া গাহিয়াছি চাঁদিনীর গান। [অস্ত চাঁদে]

মূলত *ঝরা পালক* কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দ দাশ বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক নির্মাণে যত না ছিলেন প্রাতিস্বিক ও মৌলিক, ততোধিক ছিলেন নজরুল-সত্যেন্দ্রনাথ প্রভাবিত। ফলে অন্যান্য বিষয়ের মতো উপমা সৃজনেও জীবনানন্দ দাশ এ কাব্যে নিজস্বতা নিয়ে আবির্ভূত হতে পারেন নি। এজন্যে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) পর্যন্ত।

ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে পরবর্তী কাব্যগুলিতে জীবনানন্দ দাশ যখন বিষয় চেতনা ও রূপাবয়বে স্বকীয়তাকে প্রমূর্ত করেন, প্রযুক্ত করেন আধুনিক 'জীবনানন্দীয়' অনুভব এবং প্রতিষ্ঠিত করেন জীবনদৃষ্টিসম্পৃক্ত মৌলিক অনুধ্যান, তখন উপমা অলংকার নির্মাণেও তিনি নিজস্ব ও মৌলিক কৃৎকৌশলে স্থিত হন। তাঁর এ পর্যায়ের উপমা অলংকারগুলির মৌলিকত্ব এজন্যে যে, এগুলোর উপমান পদ আমাদের দৈনন্দিন ও কোলাহলসম্পৃক্ত বিষয় ও অনুভব হলেও কবি জীবনানন্দ এগুলিতে বিতরণ করেছেন আধুনিকতার উত্তাপসমৃদ্ধ নতুন আলো। এই উপমাগুলোতে জীবনানন্দের বিশশতকীয় গহন মনোবিশ্বের জটিল রূপ-রূপান্তরের সংবেদন নিহিত। ফলে এ উপমাসমূহ উপমেয় ও উপমানপদের উপরিতলের সাদৃশ্যভাবনার প্রতিপক্ষে গভীরতলের দার্শনিক অনুভবসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে ব্যাখ্যাযোগ্য। তাই উপমা অলংকারগুলো আমাদের দৃষ্টি ও উপলব্ধিতে বিপর্যয় ও বিস্ময় সৃষ্টির পাশাপাশি হয়ে উঠেছে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যপূর্ণ, ইন্দ্রিয়স্বাদের ভিন্নতা সৃষ্টিকারী, অভিনব ও 'দূরগন্ধবহ'[৫]। যেমন—

বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার

["'অনেক আকাশ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন [ঐ]

অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে;

['অবসরের গান', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ- অবসাদ [ঐ]

হেমন্তের রৌদ্রের মতন ফসলের স্তন

['পিপাসার গান', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন

[বনলতা সেন]

নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা
['অঘ্রাণ প্রান্তরে', *বনলতা সেন*]

চায়ের পেয়ালা কটা বিড়াল ছানার মতো
['ঘোড়া', *সাতটি তারার তিমির*]

সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো...
['তিমির হননের গান', *সাতটি তারার তিমির*]

একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
['রাত্রি', *সাতটি তারার তিমির*]

এভাবে জীবনানন্দ দাশ কবিতায় উপমা অলংকার বিনির্মাণে আধুনিক দার্শনিক শিল্পভাবনাযুক্ত পঠন-পাঠন সমৃদ্ধ মননচেতনার উপর যেমন অধিক আলোক সম্পাত করেছেন, তেমনি উপমার সাহায্যে কবিতার উপরি কাঠামোর চিত্রসম্পৃক্ত সৌন্দর্য নির্মাণের পাশাপাশি এর অন্তরনিহিত অর্থময় গভীরতলের অবয়ব নির্মাণে মনোযোগী[৬] হয়েছেন।

উপমা অলংকারে কবি জীবনানন্দ দাশ উপমান পদ নির্মাণে হয়েছেন অনেক বেশি তৎপর, মনোযোগী, কুশলী ও পক্ষপাতী। তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও উত্তাপ দিয়েই শুধু এই পদসমূহ সৃজন করেন নি, বরং উপমান পদের পূর্বে বিশেষ্য বা বিশেষণ ইত্যাদি পদ সহযোগে এর যৌক্তিক সম্প্রসারক নির্মাণ ও প্রযুক্ত করে সমগ্র উপমা অলংকারটিকেই যেন এক ভিন্নতর কাব্যিক আবহ ও নান্দনিক মাত্রায় উন্নীত করেছেন। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি লক্ষণীয় :

অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।
['অন্ধকার', *বনলতা সেন*]

খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে-গান গায়- গান গায়
['আমাকে তুমি', *বনলতা সেন*]

আমাকে উঠায়ে দিয়ে মৈথুনকালের সব সাপেদের মতো মিশে গেল
পরস্পরের কায়ক্লেশে, ['ভাষিত', *সাতটি তারার তিমির*]

মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে
['হাওয়ার রাত', *বনলতা সেন*]

প্রথম উদ্ধৃতিতে উপমান পদ 'অনন্ত মৃত্যুর' পূর্বে 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর' প্রসারক প্রযুক্ত করে কবি মৃত্যুর কালগত ও মাত্রাগত তীব্রতা ও ভয়ংকর রূপকেই যেমন প্রকাশ করতে চেয়েছেন তেমনি অন্ধকার অনুষঙ্গের মধ্যে মানবীয় অবয়ব প্রদানেও সচেষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে 'রূপসীর ' পূর্বে 'বর্ষীয়সী' শব্দ সংযুক্ত করে কবি আমাদের প্রচলিত সৌন্দর্যচেতনায় তড়িৎশক প্রদান করেছেন এবং এর মাধ্যমে বাংলা কবিতার ভাবনাদিগন্তে আধুনিকতার মৌলসূত্র

সন্নিবেশ করেছেন। কেননা আমাদের প্রচলিত সংস্কারে রূপসীদের হতে হয় শুধু অল্পবয়সী ও তরুণী। তৃতীয় উদাহরণে উপমান পদ 'সাপেদের' পূর্বে 'মৈথুনকাল'- এর আবহ সংযুক্তির মাধ্যমে কবি যেন মানুষের মৈথুন মুহূর্তের আবেগ, অনুভব ও আকুতিকেই অভিব্যঞ্জিত করেছেন। সবশেষে উপমান পদ 'গর্জনের' পূর্বে 'বাঘিনী' পদ প্রযুক্তির মাধ্যমে গর্জনের তীব্রতাকে যেমন অভিচিহ্নিত করা হয়েছে, তেমনি এর পূর্বে 'মিলনোন্মত্ত' শব্দ সংযুক্তিতে এর গুণগত মাত্রা শীর্ষচূড়ায় উন্নীত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তাঁর কাব্যে উপমানপদ রূপে 'কড়ি' ও 'শঙ্খে'র পৌনঃপুনিক ব্যবহারও লক্ষণীয়। আর এসব পদের পূর্বে ও পরে রঙ ও স্বাদ-গন্ধের আবহযুক্ত সম্প্রসারক পদ সংযুক্ত করে কবি আধুনিক বিবিক্ত, নিঃসঙ্গ ও নিভৃত মনোচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেমন—

(১)

কোথায় পাহাড় দূরে শাদা হয়ে আছে যেন কড়ির মতন— ['সোনার খাচার বুকে', *রূপসী বাংলা*]

ধূসর কড়ির মতো হাতগুলো— ...['একদিন পৃথিবীর পথে', *রূপসী বাংলা*]

কড়ির মতন শাদা মুখ তার, ['শঙ্খমালা', *বনলতা সেন*]

দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে

['মানুষের ব্যথা আমি', *রূপসী বাংলা*]

(২)

সে কতো শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন

['এ-সব কবিতা আমি', *রূপসী বাংলা*]

স্তন তার

করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র- ['শঙ্খমালা', *বনলতা সেন*]

—সাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে শঙ্খের মতো কাঁদে ['তোমরা যেখানে সাধ', *রূপসী বাংলা*]

কাব্যে উপমা অলংকার নির্মাণের প্রচলিত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে কবিতার উদ্দীষ্ট ভাব বা বিষয়কে উপমেয় পদরূপে কল্পনা করে সমধর্মী বা বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অন্য কোন বিষয় বা বস্তুকে উপমান পদরূপে সাদৃশ্যভূত করার মাধ্যমে ঐ উপমানপদের স্বকীয় ধর্মকে উপমেয় পদের উপর আরোপন করা। এভাবে উপমানপদের নিজস্ব ধর্মের আলোকেই উপমেয় পদটি উপমান পদের সঙ্গে তুলনা ও প্রতিতুলনায় মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবির সিংহভাগ উপমা অলংকারই উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কবি জীবনানন্দ দাশ একই ধারাক্রমে তাঁর কবিতাসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপমা নির্মাণ করলেও কখনও কখনও তিনি তাঁর নিজস্ব আধুনিক ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের স্মারক হিসেবে এতে স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধিত ভিন্নতা প্রযুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্ট উপমা অলংকারসমূহে উপমান পদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপমেয়তে নয়, বরং উপমেয় পদের স্বকীয় বিশিষ্টতা

দ্বারাই উপমান পদ সিক্ত ও রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। এভাবে বাংলা সাহিত্যে উপমা অলংকারের নবতর যাত্রা পরিস্ফুট হয়েছে। নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহ লক্ষণীয়—

... চোখ তার হিজল বনের মতো কালো: ['সিন্ধু সারস', *মহাপৃথিবী*]

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ— ['ক্যাম্পে', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

আকাশের রং ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল ['শিকার', *বনলতা সেন*]

উদ্ধৃত প্রথম উপমায় আমাদের বিবেচনায় উপমানপদ 'হিজল বনের' কালো রং উপমেয় পদ 'চোখের' উপর নয়, বরং বিপরীতক্রমে 'চোখের' অর্থাৎ উপমেয় পদের কালোত্বই উপমানের উপর আরোপিত হয়েছে। কেননা পৃথিবীতে সবুজ হিজল বনের কালো বৈশিষ্ট্যটি যুগপৎ দুলর্ভ এবং বিমূর্ত। দ্বিতীয় উপমায় উপমান পদ 'পুরুষ হরিণ'-এর হৃদয়ের রক্তাক্তা আমাদের অনধিগম্য; বরং উপমেয় পদ কবি বা প্রেমিক পুরুষের হৃদয়ের বাঞ্ছিতার জন্য বিরহ ও অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা ও স্বপ্নভঙ্গের হাহাকারেই যেন পুরুষহরিণের হৃদয় তুল্য ও বেদনাক্ত হয়ে উঠেছে। একইক্রমে সর্বশেষ উপমায় উপমান পদ 'ঘাস ফড়িঙের দেহের' নীল রঙে নয়, বরং উপমেয় পদ আকাশের নীলেই যেন ঘাস ফড়িঙের দেহ রাঙিয়ে উঠেছে। এভাবে জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতার উপমা অলংকারে উপমান পদের পাশাপাশি উপমেয় পদকেও গুরুত্ব ও মহিমায় নবরূপ দান করেছেন। তাঁর কবিতার বহুল ব্যবহৃত উপমেয় পদ হচ্ছে 'হাত'—যেটি অগ্র ও পশ্চাতে বিভিন্ন প্রসারক সংযোগে জীবনানন্দের আধুনিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিচিহ্নিত করেছে—

—মসৃণ হাড়ের মতো শাদা হাত দুটি ... ['পরস্পর', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

... থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে— ['অশ্বত্থ বটের পথে', *রূপসী বাংলা*]

ধূসর কড়ির মতো হাতগুলো— ['একদিন পৃথিবীর পথে', *রূপসী বাংলা*]

কবিতার শিল্পপ্রকরণ হিসেবে উপমা যখন শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়বোধেরই তৃপ্তি সাধন করে না, অর্থাৎ স্পর্শ, দৃশ্য, ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সংবেদনের আলাদা আলাদা পরিতৃপ্তির পাশাপাশি এদের সম্মিলিত অনুভবের এক মোহনীয় উপলব্ধি নির্মাণ করে, কল্পনাকে করে উদ্দীপ্ত, বোধ ও চেতনায় দান করে নবতর দ্যোতনা, সর্বোপরি পাঠকের রসোপলব্ধির তৃতীয় মাত্রাকে উন্মোচিত কর,[৭] তখনই তা রূপান্তরিত হয় চিত্রকল্পে। জীবননান্দ দাশের উপমা অলংকার যেহেতু আধুনিকতাবোধের প্রবল তাড়নায়, বিশশতকীয় শিল্পবোধের সমন্বয়ে এবং ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক মনোময়তার অভিজ্ঞানে ধারণ করেছে দৃশ্যমানতার অতিরেক বিশ্লেষণসমৃদ্ধ নান্দনিক শিল্পপ্রকরণ, সেহেতু এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে আধুনিক চিত্রকল্প। নিম্নে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো :

পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম-চোখ বুজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কতো দিকে গিয়েছে সে ভেসে—

['অনেক আকাশ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

ঢেউয়ের ফেনার মতো ক্লান্ত হ'য়ে মিশিবে কি সে- ঢেউযের গায়ে!

[ঐ]

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

['বাংলার মুখ আমি', *রূপসী বাংলা*]

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল; ['বনলতা সেন', *বনলতা সেন*]

বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক আলোচিত ও শ্রেষ্ঠ উপমা দুটিই কবি জীবনানন্দ দাশের পরিকল্পিত ও নির্মিত।[৮] এই উপমা দুটি হচ্ছে—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

['বনলতা সেন', *বনলতা সেন*]

উটের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা এসে।

['আট বছর আগে একদিন', *মহাপৃথিবী*]

উপর্যুক্ত উপমা দুটিতে উপমেয় ও উপমানের উপরিতলের সাদৃশ্যের চেয়ে এদের গভীর তলের তুলনা অনেক বেশি লক্ষযোগ্য। প্রথম উপমায় পাখির নীড়ের সঙ্গে চোখের আপাত সাদৃশ্য না থাকলেও গভীর অর্থে নীড়ের শান্ত ও মমতাপূর্ণ আশ্রয় অনুভবের সঙ্গে প্রেমিকার মমতা ও আবেগসিক্ত চোখের আশ্রয়ের মিল দুর্লক্ষ্য নয়।[৯] আবার দ্বিতীয় উপমায় নিস্তব্ধতা বা মৃত্যুর সঙ্গে মৃত্যুচেতনায় প্রলুব্ধকারী উটের গলদেশের সাদৃশ্যও যৌক্তিক ও তাৎপর্যপূর্ণ—যেখানে মৃত্যুসংক্রান্ত উটের মিথ বা কাহিনীকে প্রগাঢ় আবেগসিক্ততায় বাণীরূপ দেওয়া হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের উপর্যুক্ত দুটি চিরায়ত উপমা সৃজনের পাশাপাশি তাঁর কাব্যে নির্মাণ করেছেন আরও অজস্র উপমারাশি—সেগুলো আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে সর্বদা যেমন আবেগের আলোয় সিক্ত করে, তেমনি দান করে চিন্তার নতুন উদ্ভাসন। যেমন—

বুড়ো হয়ে গেছো তুমি বুড়ি পৃথিবীর মতো। ['মেঠো চাঁদ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার ['অনেক আকাশ', ঐ]

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন [ঐ]

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন' ['প্রেম', ঐ]

নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো অস্ফুট আঙুল;

['এই সব ভালো লাগে', *রূপসী বাংলা*]

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;

['হায় চিল', *বনলতা সেন*]

পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন; ['সুরঞ্জনা', *বনলতা সেন*]

নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা

['অঘ্রাণ প্রান্তরে', *বনলতা সেন*]

সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা ['সিন্ধু সারস', *মহাপৃথিবী*]

চায়ের পেয়ালা কটা বেড়াল ছানার মতো— ['ঘোড়া', *সাতটি তারার তিমির*]

একদিন ছিলে তুমি মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের মতো; ['কবিতা', ঐ]

সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়। ['বোধ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*]

উপমা অলংকার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিসত্তার মৌলিকত্ব নির্দেশক অন্যতম শিল্পপ্রকরণ। ফলে কবিতায় এগুলোর অবিরল ধারায় প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বাংলা কাব্যে এদের পরিমাণগত সমৃদ্ধি যেমন আনয়ন করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত অভিজ্ঞানে বিবিধ কৃৎকৌশল সহযোগে রূপায়ণের মাধ্যমে এদের নিয়ে গেছেন শিল্পগত উৎকর্ষের উত্তুঙ্গ চূড়ায়। পরিণতিতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ সৃষ্ট এই উপমাসমূহ হয়ে উঠেছে অনতিক্রম্য, অভিনতুন ও তুলনাতীত।

তথ্যনির্দেশ

১. বহুলপ্রচলিত এই প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি জীবনানন্দ দাশ এক পত্রিকায় করেছিলেন বলে বুদ্ধদেব বসু আমাদের অবহিত করেছেন। [দেখুন—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত* (১৯৮৬), ভারত বুক এজেন্সি, কলিকাতা, পৃ. ১৯৪]

২. বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৫২

৩. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতা পাঠ-উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুকে চিঠির মাধ্যমে এই মূল্যায়ন করেছিলেন। [দেখুন—তপন রুদ্র সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশ কবিতা সমগ্র* (২০০০), সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, পৃ. ৪৬৫]

৪. হুমায়ুন আজাদ, *আধার ও আধেয়*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৬৪

৫. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, *জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

৬. মাহবুবুল হক, 'ভাষার কবিতা হয়ে ওঠা,', *নিসর্গ*—কবিতা ও কবিতার ভাষা সংখ্যা (সরকার আশরাফ সম্পাদিত), পনের বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০০, বগুড়া, পৃ. ১১

৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'জীবনানন্দের কবিতার চিত্রকল্প', *উত্তরাধিকার* -জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা (সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত), ২৭ বর্ষ, ২-৩-৪ সংখ্যা, ২০০১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫৬৭

৮. হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৯. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৬৯